দৈনিক জনকণ্ঠ

179

তারিখ ... ... MAR 13 2000
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন নেই

এবারকার এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল হওয়ায় দেশের সর্বত্র জনমতে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। যশোর বোর্ডের অধীন একটি কেন্দ্রে প্রাণহানির খবরে পরীক্ষায় নকলের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে অভিভাবকদের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত জেলা ডেপুটি কমিশনারদের বার্ষিক সম্মেলনে পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ডেপুটি কমিশনারগণ পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণকারী এবং তাদের সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক বিচার বা সামারি ট্রায়ালের ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। অধিবেশনের সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক জানিয়েছেন, পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনার চিন্তাভাবনা চলছে। তাঁর মতে, পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে না সাজালে নকল বন্ধ করা যাচ্ছে না।

ডিসিদের সম্মেলনে নকল প্রতিরোধ প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সন্দেহ নেই। শিক্ষামন্ত্রীর উৎকণ্ঠাও সুস্পষ্ট। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। সামারি ট্রায়াল করাই যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে ১৪৪ ধারা কার্যকর করা সম্ভব হবে না কেন? উভয় ক্ষেত্রেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেবে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের যদি গুলি না ছুঁড়ে নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য বিবেচিত হয় তাহলে সামারি ট্রায়ালই বা সম্ভবপর হবে কি করে?

ডেপুটি কমিশনারগণ সরেজমিনে উপস্থিত থাকেন, কাজেই তাদের কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের সঙ্গে সমঝোতা না করে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হবেন, এটাও আশা করা অসমীচীন। এখানে প্রয়োজন সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান এবং সেই অবস্থানে অনড় থাকার অঙ্গীকার। আগামী এসএসসি পরীক্ষায় কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করলে নির্ধারিত শাস্তি থেকে কেউই রেহাই পাবে না, এ কথা যদি সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে নকলের ব্যাপকতা হ্রাস পাবে। এ ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই দলীয় পক্ষপাত বর্জন করতে হবে এবং শিক্ষকদের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপ্যালকে মূল দায়িত্ব বহন করতে হবে।

ডেপুটি কমিশনার সম্মেলনে সম্ভাব্য পরিস্থিতির একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, একটি কেন্দ্রে যদি ৫০০ পরীক্ষার্থীর সিট থাকে এবং তাদের পৌঁছে দেয়ার জন্য যদি পরীক্ষার্থী প্রতি পাঁচজন করে আসেন, তাহলে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই হাজার। এত বড় জনসমাবেশ দেখে আরও আড়াই হাজার উৎসুক মানুষ এসে ভিড় জমাবে। ফলে আলোচ্য কেন্দ্রটিতে পাঁচ হাজার জনসমাগম হবে। এই বিশাল জমায়েতকে সরিয়ে দিতে লাঠিচার্জ নয়, গুলিবর্ষণ প্রয়োজন হবে এবং গুলিবর্ষণ করলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সমস্যা প্রত্যেক ডিসির সমস্যা, সমগ্র দেশের সমস্যা।

পরিস্থিতি এহেন চরম আকার ধারণ করার পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের আগেই সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে এই বলে যে, এ্যাডমিট কার্ড দেখিয়ে পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি পাবেন এবং অন্য কেউ সঙ্গে থাকলে তাদের

কে. জি. মুস্তাফা

গেটের বাইরে থেকেই ফিরে যেতে হবে। এভাবে প্রথম থেকেই যদি ভিড় জমতে দেয়া না হয়, তাহলে ওপরে উল্লিখিত পরিস্থিতির উদ্ভব বন্ধ করা সহজসাধ্য হতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে অবশ্যই কিছুসংখ্যক পুলিশ এবং আগ্নেয়াস্ত্রবিহীন আনসার প্রহরী থাকবে। গ্রামবাসী এবং পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ শান্তিপূর্ণ পরীক্ষাই দেখতে চাইবেন। সাতক্ষীরার কলারোয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় এটা সবারই কাম্য।

পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনকারীর সামারি ট্রায়াল বা তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা আগুনে ঘি ঢালার সামিল হবে। এ জাতীয় একটি ঘটনা সমগ্র কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দিতে পারে। যাকে বলে হিতে বিপরীত, তাই হওয়ার আশঙ্কা ষোলআনা। বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যেমন কোন পরীক্ষার্থীকে নকল করতে দেখলে তাকে হল থেকে বহিষ্কার করা, সেটাও যথেষ্ট উষ্কানিমূলক পদক্ষেপ। যদি নকলকারীকে পরীক্ষার হলে চিহ্নিত না করে তার খাতার সঙ্গে পরীক্ষকের জন্য কোন পরামর্শ দেয়া সম্ভবপর হয়, তাহলে নকলকারী শাস্তি পাবে কিন্তু পরীক্ষার হলে শৃঙ্খলার হানি হবে না। অবশ্য যেখানে গণটোকাটুকি হবে সেখানকার কথা আলাদা। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র বাতিল করাটা তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হয় না বরং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা যেতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে নকলকারীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে দোষী, দোষ নিশ্চয়ই পরীক্ষা কেন্দ্রের নয়। তবে পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক যারা, তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবেন। এদের মধ্যে যারা শিক্ষক বা শিক্ষায়তনের কর্মচারী, তাদের এক মাসের বেতন কাটা গেলেই যথেষ্ট শাস্তি হবে। আর যারা জনপ্রতিনিধি, তাদের পদ এক বছরের জন্য বাতিলযোগ্য হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতহীনভাবে তাদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন না করলে অন্যরা আস্কারা পেয়ে যাবে। রাজনীতিকরা তখনই চেপে বসেন যখন প্রশাসনের দুর্বলতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপের কোন সুযোগই নেই। তবে যদি কোন প্রশাসক বা শিক্ষক নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করতে সচেষ্ট হন, তাহলে তিনি রাজনীতিকের প্রশ্রয় পাবেন সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, জনপ্রতিনিধি জনগণের সমর্থন আদায়ে যতটা ব্যগ্র থাকবেন প্রশাসনকে খুশি রাখতে ততটা ব্যগ্র হবেন না। পরীক্ষা কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রশাসনকেই দায়ী করবেন এবং জবাবদিহিতা প্রশাসককেই করতে হবে।

নকল প্রবণতা কমানোর পন্থা হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন। নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের প্রশ্নাবলী কমিয়ে রচনামূলক প্রশ্নের অনুপাত বাড়ানোর দিকেই হয়ত শিক্ষামন্ত্রীর চিন্তাভাবনা রয়েছে। রচনামূলক বিষয়ের প্রশ্নের জবাব নকল করার চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে 'টিকমার্ক' দেয়া অনেক সহজ। সুতরাং প্রশ্নের ধারা পরিবর্তন করে নকলের প্রবণতা কিছুটা হ্রাস করা সম্ভবপর। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী অন্য যে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষা পদ্ধতির আদলে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার চিন্তাভাবনা চলছে। মন্তব্যটি উদ্বেগজনক এই কারণে যে, পাবলিক পরীক্ষা এ দেশে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত। এটার বদলে অপরিচিত মার্কিন পরীক্ষা পদ্ধতি কতটা কার্যকর বা গ্রহণীয় হবে তা বলা যায় না। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি অসৎ উপায় অবলম্বনের দুয়ার হুট করে খুলে দেবে বলে আশঙ্কা করা অমূলক নয়। পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে না সাজালে নকল বন্ধ করা যাচ্ছে না, এই অনুমান কতটা বাস্তবসম্পন্ন সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করবেন। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়— এ কথাটা প্রসঙ্গত এসে যায়। এ দেশে প্রত্যেকটি সরকারের আমলে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষানীতি, সিলেবাস নীতি, শিক্ষান্তরের মেয়াদ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং তার জন্য কমিটির পর কমিটি, কমিশন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাকার বেফজুল কাজ-কারবার করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ধরনের গোঁজামিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন মেডিক্যাল ডিগ্রীর জন্য পড়তে হয় পাঁচ বছর। অথচ ইঞ্জিনিয়ারিং বা এমএ, এমএসসি চার বছর। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী চার বছরের অথচ আর্কিটেকচার পাঁচ বছরের। আইনের মাস্টার্স আবার পাঁচ বছরের। ইন্টারমিডিয়েটের পর যে কোন মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রীর জন্য পাঁচ বছর নির্ধারণের জন্য কোন কমিশন-কমিটির প্রয়োজন নেই। কারণ ওটা রীতি। এ দেশে কেন যে দ্বিমুখী ডিগ্রীর প্রচলন রয়েছে সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তাছাড়া যে কোন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য থিসিস আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে এহেন অসামঞ্জস্য দূর করা খুব বেশি ব্যয়সাধ্য নয়, অথচ কাজটা অত্যন্ত জরুরী।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যয় করা হয়েছে অনর্থক তর্ক করে। ইংরেজী শিক্ষার অবস্থান কি হবে সেটা নির্ণয় করতে কয়েক দশক পার হয়ে গেছে। জনসংখ্যার চাপের কারণে ইংরেজী শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই চালু থাকতে পারে, আগে যেমন ছিল। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী শিখতে ছেলেমেয়েদের কোন অসুবিধা আগে হয়নি, এখনও হওয়ার সঙ্গত কারণ নেই। মাতৃভাষা সকল বিদ্যায়তনে আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য হবে।

মাধ্যমিক স্তরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয় একটি বড় সমস্যা। এ জন্য মূলত দায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থাও কঠোরতরভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

শেষ কথা, শিক্ষা নিয়ে আর এক্সপেরিমেন্ট নয়। পরীক্ষা পদ্ধতির নামে বিদেশী মডেল খুঁজে বের করার প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষা পদ্ধতি এদেশে আমদানি করার কোন প্রয়োজন বা তাগিদ মোটেই নেই। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেই শিক্ষার মান বাড়বে, নকল বন্ধ করার জন্য চাই সৎ সংকল্প।